Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

‘নাচোলের কৃষক আন্দোলন’ ও ইলা মিত্র

অপূর্ব রায়

Link : https://shorturl.at/lGKM8

সারসংক্ষেপ : বাংলার স্বনামধন্য সংগ্রামী কৃষক-নেত্রী ইলা মিত্রের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে সাঁওতাল কৃষকদের অধিকার আদায়ের এক অদম্য সংগ্রাম এই প্রবন্ধে প্রকাশ প্রকটিত হয়ে উঠেছে। ‘‘নাচোলের কৃষক আন্দোলন’’কে কেন্দ্র করে এক গৃহবধূর পারিপার্শ্বিক সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে কঠোর জীবনসংগ্রাম, মানসিক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত জয় লাভের এক অনন্য সাধারণ, প্রজ্বলিত দৃষ্টান্ত হলেন শ্রীমতী ইলা মিত্র।

সূচক শব্দ : কৃষক আন্দোলন, নাচোল, মুক্তিসংগ্রাম, তেভাগা, মাতৃভূমি,অত্যাচার, কর্মী, সাঁওতাল, খাজনা, নির্যাতন

বাংলার মহীয়সী নারী, তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী। বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকদের আদায়ের অধিকার সংগ্রামী কৃষক নেত্রী। বঞ্চিত কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা আদায়ের জন্য যিনি স্বেচ্ছায় জীবনের সমস্ত সুখ সাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন, ভোগ করেছিলেন অমানুষিক নির্যাতন সেই কৃষকদের রানীমা বা ইলা মিত্র ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, অবিভক্ত বাংলার ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল। মা মনোরমা সেন। তিন বোন তিন ভাইয়ের মধ্যে ইলাই ছিলেন জ্যেষ্ঠ।

জীবন শুরুর দিকে ইলা মিত্র গোটা ভারতবর্ষের চোখে ক্রীড়াবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল একটানা তিন বছর জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ইলা মিত্র। ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকসে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি তিনি। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা আর অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনি ১৯৪০ সালে বেথুন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৪২ সালে বেথুন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন এবং পরে ১৯৪৪ সালে একই কলেজ থেকে অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন ইলা মিত্র। চৌদ্দ বছর পর ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এম.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। ছাত্র অবস্থা থেকেই তাঁর সঙ্গে রাজনীতির পরিচয় ছিল। পর্যায়ক্রমে তিনি বিভিন্ন রকম কমিটির বা দলের সঙ্গে যুক্ত হন। যেমন গার্লস স্টোর্স কমিটি, ছাত্র ফেডারেশন কমিটি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টি। তারপর তিনি একদিকে খাদ্য আন্দোলন ও ভুখা মিছিলে কৃষকদের আন্দোলনে যোগদান করেছেন। এরপর তিনি খাদ্যাভাব, কাপড়ের সঙ্কট, মহামারী এবং নারী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে অসহায় মেয়েদের বাঁচাতে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং লড়াই করেন।

১৯৪৫ সালে ইলা মিত্রের বিয়ে হয় কমিউনিস্ট নেতা রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে। রমেন্দ্রনাথ মিত্র মালদহের নবাবগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর হাটের জমিদার। বিবাহের জন্য ১৯৪৫ সালে ইলা মিত্রকে চলে আসতে হয় চাঁপাই নবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুরে। উচ্চ পরিবারের নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙ্গে তিনি মেয়েদের জন্য গড়ে ওঠা নতুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সমস্ত নিয়মকে অতিক্রম করে, কমিউনিস্ট নেতা ও স্বামী রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। স্থানীয় মেহনতি মানুষদের নিয়ে জমিদারি উচ্ছেদ ও জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে নোয়াখালির হাসনাবাদে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজেও তিনি অংশ নেন।

বাংলাদেশের এই মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বা আন্দোলন এক দিনের নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের একত্রিত

গণসংগ্রামের একটি সংঘবদ্ধ রূপ — বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। তেভাগা, টঙ্ক, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ — কোনো আন্দোলনই মুক্তিসংগ্রামের থেকে ভিন্ন হতে পারে না। আমাদের এই মাতৃভূমি যেহেতু মৃত্তিকাকেন্দ্রিক সভ্যতার ফসল, সে জন্য এই অঞ্চলের মানুষেরা কৃষিকাজের পেশায় সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এ দেশের অর্থনীতিও প্রধানত হয়ে উঠেছে কৃষিভিত্তিক। কৃষিজীবী মাতৃভূমিতে কৃষকই হয়ে উঠেছে প্রাণ। ফলে যে-কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বা বিভিন্ন রকম চাওয়াপাওয়া আদায়ের জন্য কৃষকদেরই সংগ্রামে বা আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠে। ফলে ভারতবর্ষের সমস্ত কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কৃষকদের এসব আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল কৃষক-শ্রমিক মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষের দল ও কমিউনিস্ট পার্টি।

১৯৪২ সালে যখন এ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। কৃষকরা তখন শুরু করে 'তিন ভাগের দুই ভাগ ফসল'এর জন্য আন্দোলন। এই আন্দোলন চলে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হবার পরেও। এই সময় বর্তমান বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারের অত্যাচার ও দমনপীড়ন নীতির কারণে কমিউনিস্ট নেতারা ও কৃষক আন্দোলনের নেতারা আত্মগোপন করে থাকে। ইলা মিত্র এবং রমেন্দ্রনাথ মিত্রও নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামে আত্মগোপন করেন। এই গ্রামে ছিল সাঁওতাল নেতারা ও প্রথম সাঁওতাল কমিউনিস্ট মাতলা মাঝির বাড়ি। কৃষকদের উপর আপাতভাবে তেভাগা কার্যকর করা হলেও ভূমি মালিকরা থেমে থাকতে পারেনি। সরকারি আইনের নিয়ম কানুন ও তাদের বাহিনী নানাভাবে কৃষকদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতে থাকে। এর ফলে কিছু পুলিশ কর্মকর্তা ও পাঁচ জন কনস্টবল নিহত হয় আন্দোলনকারীদের হাতে। এরপর আরো প্রবল ভাবে শুরু হয় পুলিশ ও সৈন্যদের অত্যাচার ও নির্যাতন।

১৯৪৬ সালে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। ওই সময়কালে অবিভক্ত বাংলার ১৯টি জেলায় ৭০ লাখ কৃষক এই আন্দোলনে যোগ দেয়। শতাধিক কৃষক নেতা ও কর্মী শহীদ হন এই আন্দোলনে। তেভাগা নামে খ্যাত এই আন্দোলন সেই সময়কার বাংলার গ্রামাঞ্চলকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

জমিদার বাড়ির গৃহবধূ হলেও ইলা মিত্র স্বামীর সাহায্যে খুব দ্রুত হয়ে ওঠেন সেখানকার স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের নেত্রী। স্বামী রমেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন শান্ত প্রকৃতির স্বাধীন চেতনার মানুষ। "ফ্লোড কমিশন রিপোর্ট" বাস্তবায়ন এবং কৃষকদের জমি ভাগাভাগির বিষয় দু'টি নিয়ে পুরো দেশ তখন সরকারে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। নাচোলের সমস্ত কৃষকরাই ছিল আন্দোলনে যুক্ত। এই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল সাঁওতালরা ও সাঁওতাল দলের নেতারা। এই আন্দোলনই আজ ইতিহাসে 'নাচোল বিদ্রোহ', 'তেভাগা আন্দোলন' বা 'নাচোলের কৃষক আন্দোলন' ইত্যাদি নামে পরিচিত। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ইলা মিত্র। ১৯৪৬ সালে ইলা মিত্র তাঁর দলের সকলকে নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক যে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয় তা প্রতিহত করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

দেশভাগের পর তেভাগা আন্দোলন শেষ হয়ে গেলেও বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের নেতৃত্বে শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহ। কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে ভিন্ন ধারার কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে পূর্ব বাংলায়। ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার টঙ্কপ্রথা চলে আসছিল বিভিন্ন জায়গাতে। সে সময়ের তেভাগা আন্দোলন, নানকার আন্দোলন এবং টঙ্ক আন্দোলনের মতোই নাচোল বিদ্রোহটিও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। তাঁরা বাংলায় সমাজ বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের বৈপ্লবিক ঘরানায় একটি কৌশলগত জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। সাঁওতালেরা বংশ পরম্পরায় একই জমি চাষাবাদ করেও অধিকাংশ সেই জমির ওপর কখনো কোনো অধিকার পায় নি। জমিদারেরা তাদের থেকে ফসলের মাধ্যমে খাজনা আদায় করত।

> "স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী ফসল কাটার সময় ক্ষেতে কর্মরত প্রতিটি সাঁওতাল কৃষক প্রতি কুড়ি আড়ি ফসল কাটার বিনিময়ে তার ভাগ অনুযায়ী তিন আড়ি ধান পেত, যা তাদের নিজেদের অথবা কামলাদের মাধ্যমে পরে মাড়াই করতে হতো। আধিয়ার (ভাগ চাষি) উপজাতসহ তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক জোতদারদের দিতে হতো।"[১]

কমিউনিস্ট কর্মীরা এই শোষণ ও চাষিদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলেন।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯৫০ সালের প্রথমার্ধে নাচোল উপজেলার ঘাসুরা, চণ্ডীপুর, কেন্দুয়া, রাউতারা, জগদাই, ধারোল, শ্যামপুরা এবং নাপিত পাড়ার গ্রামের চাষিরা, সাঁওতাল চাষীরা তাদের জোতদারদের (জমিদার) খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাদের দাবি একটাই ছিল, প্রথা অনুযায়ী তিন আড়ি ধানের পরিবর্তে তাদের শ্রম-ভাড়া বা পারিশ্রমিক বাবদ কুড়ি আড়িতে সাত আড়ি ধান প্রদানে জোতদারদের রাজি হতে হবে এবং

"আধিয়ারদের মতো জমি চাষের জন্য তাদেরকে উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দিতে হবে।"[২] ১৯৪৬ সালের দিকে টঙ্কপ্রথা বিলোপের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। তখনই আন্দোলন ব্যাপক এবং বৃহত্তর রূপ ধারণ করে। আর তখনই ইলা মিত্রকে সাঁওতাল কৃষকরা পাশে পেয়ে নতুন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে। ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ — সবাই ইলা মিত্রকে 'রানীমা' নামেই ডাকত। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সাঁওতালদের কাছে থেকে সাঁওতালি ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। আন্দোলনকারীদের রুখতে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে স্থানে ক্যাম্প বসাতে থাকে। দমন-পীড়ন নামক অত্যাচার শুরু করতে থাকে পুলিশ বাহিনী। আন্দোলনের অন্যতম নেতা ললিত সরকারের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় আগুনে। একই সময়ে বহেরাদলী গ্রামে পুলিশ ব্যাপক তল্লাশি করতে করতে বিখ্যাত হাজং নেত্রী কুমুদিনী হাজংকে ধরে ফেলে পুলিশ। তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় রশিমণি হাজং তাঁকে ছাড়াতে গেলে পুলিশের গুলিতে মারা যান হাজংমাতা রশিমণি।

পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে পড়ে। পরে পুলিশ বাহিনীর দিকে ক্ষিপ্ত সাঁওতাল কৃষক, জনতা — বল্লম, ইট ছুঁড়তে থাকে। বল্লমের আঘাতে দুজন পুলিশ মারা যায়। একে একে সমস্ত কৃষক টঙ্ক দেওয়া বন্ধ করে দেয়। অত্যাচার নির্মমভাবে নেমে আসে কৃষকদের ওপর। বিপ্লবী মঙ্গল সরকারের নেতৃত্বে একটি মিছিল চলছিল। সেই মিছিলের উপর পুলিশ গুলি করলে ১৯ জন বিপ্লবী কৃষক মারা যায়। প্রচুর কৃষককে গেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে অশ্বমণি ও ভদ্রমণি হাজংয়ের ১২ বছর জেল হবার জন্য বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষ শুরু হয়। বহু পুলিশ নিহত হয় এবং তার সঙ্গে জোতদারদের ঘরবাড়ি লুট হতে থাকে। জমিদার ও জোতদারগণ পুলিশের সাহায্য নিয়ে কৃষকদের উপর পাল্টা অত্যাচারের করতে থাকে। এতে আন্দোলন আরো ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কৃষক সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন ইলা মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী, আজহার শেখ, বৃন্দাবন সাহা এবং আরও প্রায় কুড়ি জন সংগ্রামী। তাঁদের সকলকেই পুলিশ একে একে গ্রেফতার করা করে এবং বিচার করে দীর্ঘমেয়াদী দণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ইলা মিত্র-সহ অনেকেই মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫০ সালের "পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব"[৩] আইনে সাঁওতাল চাষিদের জমির ওপর অধিকার দেওয়া হতে থাকে এবং তারা অন্যান্য সাধারণ চাষিদের মতো প্রচলিত হারে নগদে খাজনা পরিশোধের অধিকার লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বহু সাঁওতাল চাষি পুলিশের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে নিজেদের গ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে যান।

কৃষক সমিতির মূল কেন্দ্র ছিল চণ্ডীপুরে। সেখানে প্রতিনিয়ত পাহারায় থাকত প্রায় চার — পাঁচশ কৃষক। সেই জায়গার রিপোর্ট পেয়ে সরকারি মহল উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সরকারি লোকের কৃষকদের শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। সেই জন্যই সেখানকার অবস্থা সামাল দিতে দ্রুত সেই জায়গাতে পুলিশ বাহিনীকে পাঠানো হয়। প্রত্যেকের হাতে ছিল রাইফেল ও বন্দুক। পুলিশ বাহিনী আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে এবং তা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সাঁওতাল কৃষকরা। বুদ্ধি খাটিয়ে প্রথমে কিছুটা পিছনের দিকে এগিয়ে আসে কৃষকরা। তারপর পুলিশের দল পেছন ফিরে দেখল, তাদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সাঁওতাল কৃষকরা। শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালের ৫ জানুআরি পুলিশ ও কৃষকদের মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দুই দিন পর নাচোলে প্রায় দু'হাজার সেনা প্রেরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু সেনারা এসে ওই এলাকায় ব্যাপক অত্যাচার করতে থাকে, গুলি করে প্রচুর মানুষকে হত্যা করে এবং তারা জ্বালিয়ে দেয় ১২টি গ্রামের কয়েক'শ বাড়ি-ঘর। এদের বেশীরভাগই ছিল সাঁওতাল অধিবাসী। পাকিস্তানি সৈন্য এবং পুলিশের অত্যাচারে, ভয়ে একে একে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি। এদেরই সঙ্গে ইলা মিত্র সাঁওতালদের পোশাক পরে পালিয়ে যান। পোষাক পরিবর্তন করলেও ভাষা না জানার কারণে সে সময় কমরেড রমেন্দ্রনাথ মিত্র আর ইলা মিত্র আলাদা হয়ে পড়েন। কয়েকশ জঙ্গি সাঁওতাল-সহ রমেন্দ্রনাথ নিরাপদে সীমান্তের ওপারে চলে যান। কিন্তু পুলিশ বাহিনী হাতে ইলা মিত্র ধরা পড়েন। ইলা মিত্র তিন-চারশো সাঁওতাল নিয়ে সীমান্ত পার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবার মতো লোক ছিল না। ফলে ভুল পথে চলতে চলতে রহনপুর স্টেশনের কাছে এসে ইলা মিত্রকে ধরা পড়তে হলো। রহনপুর থেকে পুলিশের হাতে ইলা মিত্র ও তাঁর একশো সাঁওতাল কৃষক গ্রেফতার হন।

নাচোল থানায় এনে ইলা দেবীর উপর চলে পুলিশী নির্মম অমানুষিক নির্যাতন। প্রথম ধাপে টানা চার দিন চলে এই নির্মম নির্যাতন। প্রচণ্ড জ্বর এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ হাসপাতালে। ওই মাসেই ২১ তারিখে তাঁর উপর দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর সেখানেই শুরু হয় নির্মম নির্যাতনের দ্বিতীয় ধাপ।

ইলা দেবীকে যে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয় সেই সম্পর্কে ইলা মিত্র রাজশাহী আদালতে যা বলেছিলেন তা ছিল এরকম —

> "কেসটির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। বিগত ০৭/০১/১৯৫০ তারিখে আমি রহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ হত্যাকারীর সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে বলে এস.আই আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মত কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গাভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে। আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি, এক বিন্দু জলও নয়। সেদিন সন্ধ্যা বেলাতে এস.আই এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত শুরু করে।...তারা অমানুষিক নির্যাতন চালায়। সেলে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিল। তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিৎ করে শুইয়ে দেয় এবং একজন আমার যৌনাঙ্গের ভিতর একটা ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমি আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ৯ জানুয়ারি ১৯৫০ সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এস.আই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুট দিয়ে আমাকে চেপে লাথি মারতে শুরু করল। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সেই সময় আধাচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস.আই কে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না কর তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস.আই এবং সেপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিল। কিন্তু যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজি হলাম না তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখল এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি ধর্ষণ করতে শুরু করল। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরদিন ১০ জানুয়ারি যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে, আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে এবং কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। এরপর আমাকে নবাবগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হলো এবং ২১ জানুয়ারি নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানকার জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলো।... কোন অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি।"[৪]

এরপর সরকারের নির্দেশে ঢাকার সেন্ট্রাল কারাগারে ইলা মিত্রকে রাখা হয়। সেখানেও অনিয়মিতভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে। শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ইলা মিত্রকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সঙ্গীন অবস্থার কারণে ১৯৫৪ সালের ৫ এপ্রিল তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পাঁচ সদস্যের এক কমিটি ইলা মিত্রর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে একটি প্রতিবেদন লেখেন। সেখানে বলা হয় যে এই অবস্থায় যদি ইলা দেবীকে মুক্তি দেওয়া না হয়, তাহলে আর তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যাবে না।

এমন অবস্থায় ইলা মিত্রকে দেখতে ঢাকা সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে শত শত ছাত্র-ছাত্রী, রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক-সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা হাজির হন।

একটানা প্রায় আড়াই বছর জেলে থাকবার পর তিনি ১৯৫৪ সালে "যুক্তফ্রন্ট" সরকারের সময়ে জামিনে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পরই ইলা মিত্র কলকাতায় চলে যান উন্নত চিকিৎসার জন্য। এরপর তার আত্মীয়-স্বজনরা আর তাকে এদেশে আসতে দেননি। তিনি পরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ভোটে কলকাতা মানিকতলা বিধানসভা আসনে দাঁড়ান এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিএম) হয়ে চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। তেভাগা বা নাচোলের কৃষক আন্দোলন হয়তো সফল হয়নি কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলনের পথ তিনি দেখিয়ে ছিলেন। তবে এখানেই শেষ হয়নি তাঁর লড়াকু জীবন। পশ্চিমবঙ্গেও একাধিকবার জড়িয়েছেন বিভিন্ন আন্দোলনে। খেটেছেন জেলও। আজীবন কমিউনিস্ট এই নেত্রী লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর বাংলার রানীমা ইলা মিত্রর ৭৬ বছর বয়সে কলকাতায় জীবনাবসান হয়।

"হিরোশিমার মেয়ে" বইটির জন্য ইলা মিত্র 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু' পুরস্কার লাভ করেন। অ্যাথলেটিকসে অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া ভারত সরকার তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে স্বতন্ত্র সৈনিক হিসাবে "তাম্রপত্র পদক"এ ভূষিত করে সম্মানিত করেন। কবি গোলাম কুদ্দুস তাঁকে নিয়ে কবিতা লেখেন "ইলা মিত্র"।

তথ্য সূত্র :

১। 'বাংলার তেভাগা, তেভাগার সংগ্রাম', জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯

২। ওই, পৃ. ৭২

৩। ওই, পৃ. ৯৮

৪। 'ইলা মিত্রের জবানবন্দী', শেখ রফিক, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুআরি ২০১৩, পৃ. ১৬-১৭

গ্রন্থ ঋণ :

'ইলা মিত্র নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী', মালেকা বেগম, সুন্দর প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮

লেখক পরিচিতি :

অপূর্ব রায় : প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়